সংকলন - ১ । ডিসেম্বর ২০১২

নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

সম্পাদকীয়

নবদিশা পত্রিকার সূচনা:আমাদের কথা

নবদিশা পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রকাশ যে সময় করা হচ্ছে, আমাদের এই বাংলায় সেই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধ শতবর্ষের সময়। মূলতঃ আমাদের এই পত্রিকার পাঠক-পাঠিকা হবেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং শিক্ষাচর্চার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ। তাই এই পত্রিকাটি পৌঁছে দিতে চাই বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কাছে এবং যাঁরা শিক্ষার জন্যই নিরন্তর কাজ করে চলেছেন তাঁদের কাছেও। প্রচলিত যে শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সমাজে চালু আছে সেটা তো চলছে, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতির নবীকরণের মধ্যে দিয়ে কীভাবে শিক্ষা সমাজের ব্যবহারিক জীবনে ছাত্রছাত্রীদের মানবিক মূল্যবোধে স্থান করে নিতে পারে তারই চর্চার সলতেটাকে উস্কে দেবার জন্যই এই পত্রিকার জন্ম। আমাদের কাছে মনে হয়েছে সাংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে। সমাজে তার প্রভাব সুদূর প্রসারী। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, অন্তর্নিহিত শক্তি ও আত্মিকতা, আধ্যাত্মিকতা বিকাশের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষা। অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে সব মানুষের মধ্যে, শিক্ষার সাহায্যে সেই সুপ্ত শক্তি ও সম্ভাবনা বিকাশ লাভ করবে এবং বিচিত্র কর্মস্রোতে প্রযুক্ত হবে। শুধু পুঁথি পড়লে হবে না, মানুষের অন্তরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অনন্ত পুস্তকাগার। সেটা যেন আমরা ভুলে না যাই। মনীষী রবীন্দ্রনাথ যেটা বলেছিলেন সেটাও আজকের বাজার-নির্ভর যুগে খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে - "শিক্ষা শুধু মনকে জাগিয়ে

শিক্ষার মধ্য দিয়ে গ্রামে আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে নিজেদের মাটি, পরিবেশ, সংস্কৃতি, সম্পর্ক জানতে ও শিখতে পারে এবং আমাদের গ্রামের যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সম্পদ আছে তাকে কাজে লাগিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাতে আনন্দের মধ্যে দিয়ে নিজেদের উন্নয়ন নিজেরা করতে পারে তারই চর্চার মাধ্যম হয়ে উঠুক এই পত্রিকা, এটাই আমাদের কাম্য।

কৌতূহলী করবে, সহানুভূতির সম্পর্ক তৈরি করবে, মার্জিত রুচি, শরীর ও মনে একজন গোটা মানুষের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। জীবিকার সঙ্গে জীবনের যোগ থাকতে হবে তবেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে।" যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায় সেই হচ্ছে শিক্ষা, অর্থাৎ নিজের পায়ে চলবার সক্ষমতা অর্জন করার নামই শিক্ষা। শিক্ষার মধ্য দিয়ে গ্রামে আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে নিজেদের মাটি, পরিবেশ, সংস্কৃতি, সম্পর্ক জানতে ও শিখতে পারে এবং আমাদের গ্রামের যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সম্পদ আছে তাকে কাজে লাগিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাতে আনন্দের মধ্যে দিয়ে নিজেদের উন্নয়ন নিজেরা করতে পারে তারই চর্চার মাধ্যম হয়ে উঠুক এই পত্রিকা, এটাই আমাদের কাম্য।

প্রচলিত যে শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সমাজে চালু আছে সেটা তো চলছে, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতির নবীকরণের মধ্যে দিয়ে কীভাবে শিক্ষা সমাজের ব্যবহারিক জীবনে ছাত্রছাত্রীদের মানবিক মূল্যবোধে স্থান করে নিতে পারে তারই চর্চার সলতেটাকে উস্কে দেবার জন্যই এই পত্রিকার জন্ম।

কেন সংস্কৃতির চর্চা

"যে বর্বর কেবলমাত্র জীবিকার গণ্ডিতে বাঁধা, জীবনের আনন্দ প্রকাশে যে অপটু মানবলোকে তার অসম্মান সকলের চেয়ে শোচনীয়।" -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দশজনকে নিয়ে গান গাওয়া, নাটক অভিনয় করা, কবিতা শুনিয়ে বা অন্য নানাভাবে খুশি করা মন্দ কাজ নয়। মানুষ শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকে না, তার প্রাণের আরও নানা তাগিদ আছে। এই জন্য আনন্দের একটা দিলখোশ ভূমিকা আছে এবং থাকবে সন্দেহ নেই। তা নিয়ে বিতর্ক থাকার কথা নয়। মুশকিল হচ্ছে সংস্কৃতি বা সংস্কৃতিচর্চা বলতে এই সাধারণ ধারণাই সমাজে কমবেশি প্রতিষ্ঠিত। প্রাণের সাথে প্রাণের যোগ ঘটানোর কাজটাই সংস্কৃতিচর্চার প্রধান কাজ। কেন আজকে এ বিষয়ে জোর দিতে হবে, কারণ আজকের সভ্যতা মানুষকে আর্থিক জীবে পরিণত করেছে। অর্থ ছাড়া আমরা আর কিছুই ভাবতে পারি না, পুরোটাই বাজার-নির্ভর সংস্কৃতি। তাই তো হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের করুণা, ক্ষমা, সহানুভূতি, টাকার পেছনে সবাই দৌড়চ্ছে, তার পথ ধরে ক্রমশ বাড়ছে মানুষের প্রতি মানুষের বিচ্ছিন্নতা। জীবনযাপনের যে আত্মিক যোগের একটা ভূমিকা আছে সেটা আমরা ভুলতে বসেছি। মানুষ শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবছে, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। সভ্যতা একটা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে ক্রমশ। এক বিরাট সংকট ঘনিয়ে আসছে।

অন্যদিকে সংস্কৃতি মানুষকে বদলায়, আমাদের রূপান্তর ঘটায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদকে কমিয়ে আনে। সংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে দিয়ে মানুষের যে রূপান্তর হয় তার মধ্যে দিয়ে মানুষের বিকাশ ঘটে। যিনি সংস্কৃতির সরাসরি চর্চা করেন তিনি যেমন চর্চা বা সাধনার মধ্যে দিয়ে বদলে যান, তেমনি সংস্কৃতির সংস্পর্শে অন্যদেরও রূপান্তর ঘটে।

মনে রাখতে হবে এই বিকাশ আপনাতেই ঘটে না। একটা আনন্দের পরিসর তৈরি করতে হয়। গ্রামে, সংসদে, পাড়ায় পাড়ায় যে সাংস্কৃতিক কাজে আত্মমগ্ন শিল্পীরা আছেন তাদেরকে একসাথে করে সেই ভাবনায় কাজটা শুরু করতে হবে। মনে রাখতে হবে মানুষের বুদ্ধি-বোধ-আবেগ, ভাব, চিন্তাসহ মানুষ তার সকল বৃত্তি নিয়ে যখন জেগে ওঠে তখনই সেটা হয়ে ওঠে আনন্দ। সেই স্বাদ যখন মানুষ পায় তখন তার রূপান্তর ঘটে, সে আর তখন আগের মানুষ থাকে না, নিজের মধ্যে নিজের বিকাশ বোধ করে মানুষ। আজকে আমাদের অন্তরের দরজা খোলা রাখার কথা, সেটা আমরা উল্টে

মানুষের বুদ্ধি-বোধ-আবেগ, ভাব, চিন্তাসহ মানুষ তার সকল বৃত্তি নিয়ে যখন জেগে ওঠে তখনই সেটা হয়ে ওঠে আনন্দ। সেই স্বাদ যখন মানুষ পায় তখন তার রূপান্তর ঘটে, সে আর তখন আগের মানুষ থাকে না, নিজের মধ্যে নিজের বিকাশ বোধ করে মানুষ।

পেরেক মেরে বন্ধ করে রেখেছি। সেই দরজা ভেতর থেকে খোলা যায় না, বাইরে থেকেও নয়। নিজেদের হৃদপিন্ডের ওপর নিজেরাই খিল দিয়ে বসে আছি। পশ্চিমকে আদর্শ ধরে নিয়ে নিরন্তর অনুকরণের চেষ্টা করছি আমরা, কিন্তু পশ্চিমের ইতিহাস আর আমাদের ইতিহাস তো এক নয়। তাছাড়া আমাদের স্বার্থের সঙ্গে পশ্চিমের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক স্বার্থের সংঘাত আছে। আমাদের পথ তো আমাদের নিজেদেরই তৈরী করতে হবে। আমাদের প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার পথ, নিজেদের সংস্কৃতির ভিতের উপর দাঁড়িয়ে নিজেদের পথ নিজেরা স্থির করে নিতে হবে। পশ্চিম দাবী করছে তার সংস্কৃতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি। এটাই সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশ, আর অন্য সকল সংস্কৃতি "অসভ্যতার" স্তর পেরোয়নি, "আধুনিক" হয়ে ওঠেনি। অতএব অন্যরা সভ্য নয়। এই প্রক্রিয়াকে আমাদের রুখতে হবে। আমাদের যে অমূল্য ঐতিহ্য সাংস্কৃতি সম্পদ আছে তাকে নবীকরণের মধ্যে দিয়েই রক্ষা করতে হবে। আজ দুনিয়ায় স্বার্থবুদ্ধি, এতটাই প্রবল হয়েছে যে, নিজের খুঁটি যদি নিজেরা শক্ত না করি, যদি শক্ত হাতে খুঁটি না ধরি তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। তাই মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হয়ে ওঠার জন্যই আজকে সাংস্কৃতিক চর্চাটা খুবই জরুরী। তাই আমাদের কাছে সংস্কৃতিচর্চার পথ সরু গলি নয়, প্রশস্ত রাজপথ হয়ে উঠুক। সংস্কৃতিচর্চার প্রয়াস আজ সীমিত আছে অল্প মানুষের মাঝে, আশা করা যায় ক্রমে তা বিস্তৃত হবে বহু মানুষের চেতনায়। ■■

নবদিশা পাঠকদের কাছে আহবান

শিক্ষা নিশ্চয়ই শুধু শ্রেণীকক্ষে আবদ্ধ নয়।

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার খোঁজে শিক্ষক এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন তাঁদের চিন্তা-অভিজ্ঞতা বিনিময় করার মঞ্চ হল এই নবদিশা পত্রিকা।

আপনাদের মতামত, শিক্ষা নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে সাধারণ পাঠক্রমের বাইরে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমরা আশা করি নবদিশা পত্রিকার মাধ্যমে বিনিময় হবে।

- জানার জন্য, শেখার জন্য ও জানানোর জন্য।

যোগাযোগের ঠিকানা :
নবদিশা
৫/১/২/জি কর্নফিল্ড রোড, কলিকাতা - ৭০০ ০১৯
যোগাযোগ নং - ৯১-৩৩-৬৫২২১০৯৭

এই সময় ও জীবনমুখী শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা

ভারত গত ১০-১৫ বছর ধরে উচ্চ অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সাক্ষী, তা সত্ত্বেও গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিশাল একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এখনও শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে প্রচুর মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে বসবাস করেন। অনেক গ্রামীণ জেলা আছে যেখানে মাথা পিছু গৃহস্থলী উৎপাদন সারা দেশের গড়ে এক চতুর্থাংশ। জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করা সত্ত্বেও গ্রাম ও শহরের উন্নয়নের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়ে গেছে।

বেশিরভাগ উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে শহরে, কিন্তু ভাবতে হবে আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতিক ভৌগলিক অবস্থা বৈচিত্র্যে ভরা। বিভিন্ন জনজাতির অবস্থানও প্রধানত গ্রামে। তাদের আচার, আচরণ, ব্যবহার, ধর্ম, ভাষা, কৃষি, খাদ্যাভ্যাস জীবনযাপন আলাদা আলাদা, পেশা, ভাষাগত চাহিদা, তাদের আশা আকাঙ্খা আলাদা আলাদা।

এই সংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে শহরকেন্দ্রীক উন্নয়নের জয়ধ্বজা কতদিন উড়তে থাকবে তা একটা প্রশ্ন চিহ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়ে তথাকথিত উন্নয়নকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। কেন এমন হলো? শিক্ষাব্যবস্থার দিকে যদি একটু আলোকপাত করা যায় তাহলে হয়তো কিছুটা এর হদিস পেতে পারি।

আসলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটাই শহরকেন্দ্রীক। শিক্ষার উদ্দেশ্য এমন হবে যা গ্রামীণ সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করবে। যেটা হওয়া দরকার সেটা হচ্ছে গ্রামের মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা, সমৃদ্ধ করা এবং এই আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে নবীকরণের মধ্যে দিয়ে একটা দিশা দেওয়া তারা যাতে ব্যবহারিক জীবনযাপন ভালো ভাবে করতে পারে।

অথচ সংবিধানে সিডিউল ৭৩ তম সংশোধনের ১১ তম ধারার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক স্তরে গ্রামীণ শিক্ষাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানকে। এই শিক্ষাব্যবস্থার দেখভাল করার দায়িত্বও গ্রাম পঞ্চায়েতের। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় শিক্ষা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হয়ে চলেছে, এর জন্য দায়ী কে? আর এটা জানতে হলে আমাদের একটু অতীতের দিকে মুখ ফেরাতে হবে।

ইতিহাসে দেখা যায় ১৮৩৫ সালে বড়লাট বেন্টিঙ্ক, মিঃ উইলিয়াম অ্যাডমকে স্পেশাল কমিশনের পদ দিয়ে বাংলা এবং বিহারের প্রাথমিক শিক্ষার একটি সমীক্ষা করার দায়িত্ব দিলেন। ৩ বছর ধরে অ্যাডম বাংলা-বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে, দেখেন যে, সে সময় ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের প্রতি ৩১টি বালকের জন্য একটি করে পাঠশালা ছিল। বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ তিনটি জেলায় লোকসংখ্যার জন্য ১০৯৮টি বাংলা স্কুল ও ১০টি হিন্দী স্কুল ছিল, অর্থাৎ সে সময়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে ১১০৮টি দেশীয় পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হত। ৪ বছর বয়সে তাদের শিক্ষা শুরু হত এবং ১৪ বছর বয়সে তা শেষ হত। শিক্ষার খরচও ছিল কম; সব ধর্মের ও বর্ণের শিশুদের জন্য ছিল পাঠশালায় অবারিত দ্বার।

১৮৩৮ সালে তিনি একটা বিশদ রিপোর্টও দিয়েছিলেন এবং কয়েকটি প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। প্রস্তাবগুলি ছিল:

১) দেশজ শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকের মান উন্নয়ন প্রয়োজন;
২) শিক্ষার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য পরিদর্শক নিয়োগ;
৩) যে সব গুরুমশাই ভালো পড়াবেন তাঁদের পুরস্কার ও অনুদান প্রদান;
৪) ভালো গুরুমশায়দের ভরণপোষণের জন্য গ্রামে জমি প্রদান;
৫) শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য জেলায় একটি করে নর্মাল স্কুল প্রবর্তন;
৬) পাঠ্য বই প্রণয়ন ও বিতরণের জন্য দায়িত্ব অর্পণ;
৭) নির্ধারিত জেলায় শিক্ষাকতার মান, বিদ্যালয়ের অবস্থা, পড়ুয়াদের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সমীক্ষা চালানো হোক।

তৎকালীন সরকার অবশ্য টাকার অভাবে সুপারিশগুলি মেনে নিলেন না। কিন্তু সে সময়কার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য মেকলে সাহেব (Thomas Babington Macaulay), অ্যাডমের এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করলেন। বড়লাট বেন্টিংক-ই মেকলেকে শিক্ষার উন্নয়ন ও নীতি নির্ধারণ কমিটির মাথায় বসিয়েছিলেন। মেকলে সাহেব একটা প্রতিবেদন দাখিল করলেন। এটাই "মেকলের মিনিটস" (Macaulay's Minutes on Indian Education) বলে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষ আলোচ্য বিষয়। তাতে ছিলঃ

১) আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব যাতে ইংরেজ শাসক ও লক্ষ লক্ষ শাসিত প্রজাদের মধ্যে যোগসূত্র, দোভাষী গড়ে তোলার জন্য একটি শিক্ষিত শ্রেণী তৈরি হয়;
২) এরা হবে রঙে ও রক্তে ভারতীয় কিন্তু রুচিতে, মতামতে, বুদ্ধিতে, নৈতিকতায় ইংরেজ;
৩) ভারতীয় মানসিকতা ইংরেজ রীতিনীতির মাধ্যমে প্রসার লাভ করবে।

অ্যাডম এই পরিকল্পনা বিরোধিতা করলেন। এতে দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে উপেক্ষা করা হবে। তিনি মনে করিয়ে দেন -

- হিন্দু ও মুসলমানেরা বৃটিশ শাসনের পূর্বেও ছিলেন এখনও আছেন। নতুন শিক্ষা পরিকল্পনার বাইরে থেকেই তাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশের মানস গঠন করে আসছে।
- একথা ভুললে চলবে না হিন্দুরা বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্য জাতিদের মধ্যে অন্যতম।
- আমরা কি এই সু-প্রাচীন শিক্ষা সবই বর্জন করব?

মনে রাখতে হবে কোন প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন গড়ে ওঠার আগে সমাজ থেকে উঠে আসা অভিজ্ঞ যোগ্যরাই বসেছেন শিক্ষার আসনে। বাংলার লোককথা, রূপকথা নিজস্ব কৃৎকৌশল শিখিয়ে যাচ্ছেন বংশপরম্পরায়। সেটাকে নষ্ট করে তার ধ্বংসস্তূপের উপরই গড়ে উঠল ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক সময়ের শিক্ষাধারা।

এই শিক্ষাধারা যেদিকে ধাবিত হচ্ছে তাতে বেশিরভাগ গ্রামের যুবক যুবতীরা শহরের পথে পা বাড়াচ্ছে। কারণ তারা যা শিখতে চায়, জানতে চায় এই শিক্ষা পদ্ধতিতে সেটা নেই।

ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করার জন্য পশ্চিমী ধাঁচে আধুনিক শিক্ষা চালু হয়ে ছিল। বা বলা চলে শহরকেন্দ্রীক শিল্প সমাজের দিকে তাকিয়েই বর্তমানের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্ম হয়েছে। মেকলের কথাটা আরেকবার বলা দরকার সেটা হল "আমি বা আমরা কখনও এই দেশটিকে বশীভূত করতে পারবো না, যদি না এই ভারতীয় জাতির সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে ভাঙ্গা যায়। তাই আমি প্রস্তাব রাখছি ভারতীয়দের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার উপর ইংরাজী শিক্ষাকে প্রতিস্থাপন করা হোক।" ভারতীয়রা যেন ভাবে ইংরেজদের শিক্ষানীতিই সর্বোত্তম শিক্ষানীতি এবং পরাধীনতাকেই যেন ভারতীয়রা স্বাধীনতা বলে ভাবে এবং ইংরেজদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয় তাদের।

স্বাধীনতার পর যখন শিক্ষা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হলো তা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের আওতায় এলো। সেদিন থেকে একটা সংগ্রাম শুরু হলো আত্মশিক্ষার ধারাটা তাহলে কি হবে? সরকার শিক্ষা খাতে যে টাকাটা বরাদ্দ করছে সেটা হচ্ছে পরিকাঠামো গত চাহিদা থেকে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা একটা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। খুব করুণ পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। সরকারী শিক্ষা পরিসংখ্যান রির্পোট থেকে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে -

- ৩৮% স্কুলছুট হয় ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণীর মধ্যে,
- ৬২% স্কুলছুট ক্লাশ ১ম থেকে ৭ম শ্রেণীর মধ্যে এবং
- ৭৫% এর বেশী স্কুলছুট ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী অবধি।

এই পরিসংখ্যানটি নেওয়া হয়েছে ২০১১ বার্ষিক গ্রামীণ শিক্ষার প্রতিবেদন থেকে। এর থেকেই আমাদের পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

"ভারতীয়রা যেন ভাবে ইংরেজদের শিক্ষানীতিই সর্বত্তম শিক্ষানীতি এবং পরাধীনতাকেই যেন ভারতীয়রা স্বাধীনতা বলে ভাবে এবং ইংরেজদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয় তাদের।"

শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে বাস্তবে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক শর্তের উপর দাঁড়িয়ে শিক্ষার যে চাহিদা আছে তাতে গ্রামীণ যুবকরা বঞ্চিত হয়। তাদের সাংস্কৃতিক শিকড়টাকেই উপড়ে ফেলা হয় এবং যে স্বকীয় পরিচয় ও ঐতিহ্য আছে তাকে স্বীকার করা হয় না। তার ফলে গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা না পারছে শহরে নিজেদেরকে স্থান করে নিতে, না পারছে গ্রামে। তাই শহরকেন্দ্রীক এই শিক্ষাব্যবস্থা গ্রামীণ যুবক-যুবতীদের হতাশায় গ্রাস করে বসেছে।

গ্রামে নিজেদের সম্প্রদায়ের জায়গা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। গ্রামাঞ্চলে বাঁচার জন্য যে সমস্ত বৃত্তিমূলক দক্ষতা দরকার তা তাদের থাকে না, ফলে তারা গ্রাম ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে, মা-বাবা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে চাকুরীর সন্ধানে শহরে স্থানান্তরিত হয়। "না ঘরকা, না ঘাটকা" অবস্থায় রয়ে যায়।

কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম "সর্বশিক্ষা অভিযান" এই অভিযানে মূলতঃ জোর দেওয়া হয়েছে স্কুলের পরিকাঠামোর উপর, সর্বস্তরে স্কুলছুটদের তালিকা তৈরী, মধ্যাহ্নকালীন ভোজন ইত্যাদির উপর।

পশ্চিমবঙ্গে একসময় ডিফিড (ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশ্যানাল ডেভেলপমেন্ট) - এর সাহায্যে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচীতে সর্বশিক্ষা অভিযানের ইস্যূগুলোতে জোর দেওয়া হয়েছিল। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তাদের দায়বদ্ধতাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অনেক এনজিও-রা (অসরকারী সংগঠন) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল শিক্ষা অধিকার আইন যা ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সিদের বিনামূল্যে আবশ্যিক শিক্ষা অধিকারের বাস্তবায়নের জন্য, তার প্রচার অভিযান শুরু করে ছিল। যদিও বা সেটা ধীরগতিতে এগিয়ে ছিল। কিন্তু শিক্ষার বাস্তবধর্মী পাঠক্রম গ্রামীণ দরিদ্র যুব পরিবারের বিশেষ করে শিশুদের প্রাপ্ত হয়নি, যেটা হয়েছে গ্রামীণ পরিবারের যুবাদের জন্য বিকল্প চালানো অসরকারী সংগঠন দ্বারা আরো বিষয়গত উপযুক্ত শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা গড়ে তোলার বিচ্ছিন্ন কিছু প্রচেষ্টা।

আরও একটি ইতিবাচক উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্কুলছুটদের জন্য রাজ্যস্তরের পশ্চিমবঙ্গ বৃত্তিমূলক বোর্ডের সাম্প্রতিক স্কুলে বৃত্তিমূলক কোর্স। এজন্য উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ (স্কুল ছুটির পর) ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এই বৃত্তিমূলক কোর্স বেশির ভাগটাই শহরকেন্দ্রীক দক্ষতা গড়ে তোলার উদ্যোগ।

স্কুল শিক্ষা ২০০৪ জাতীয় জ্ঞান কমিশনের (National Knowledge Commission) প্রতিবেদন থেকে শিক্ষার মৌলিক বিষয় এবং সমস্যা সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য দেওয়া হল। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে বিদ্যালয়ের উন্নতি বিষয়ে দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে। এর মানে হল বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে ফান্ড ব্যবহার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে থাকে।

পাঠক্রম সংস্কার করা অত্যন্ত জরুরী এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিটি বিদ্যালয়ে। মনে রাখতে হবে

- বিদ্যালয়ের শিক্ষা শিশুদের সমাজে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে আরও প্রাসঙ্গিক হতে হবে।
- বইকেন্দ্রীক বিদ্যার ভার আরো কমাতে হবে।
- স্থানীয় সংস্কৃতিকে ভিন্ন মাত্রা দিতে হবে যুবসমাজের দক্ষতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে।

আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েও দেখি যে, প্রধান সমস্যা হল যে শিক্ষা গ্রামীণ স্কুলে দেওয়া হয় গ্রামের দরিদ্র পরিবারের শিশুদের, সেটা একেবারেই শহরকেন্দ্রীক, গ্রামীণ শিশুদের যে চাহিদা থাকে তার সঙ্গে মেলে না। স্থানীয় সম্প্রদায়ের সামাজিক, সাংস্কৃতির ঐতিহ্যের যে বৈশিষ্ট্য আছে তা থেকে এই শিক্ষা বিচ্ছিন্ন।

এ থেকেই বোঝা যায় মেকলের শিক্ষানীতি আমাদের রক্তের মধ্যে ঢুকে আছে। শহরের সংস্কৃতির বাঁধনে বাজারের ভোগবাদ অর্থনীতিকে আরো কি করে চাঙ্গা করা যাবে তারই জয়গান গাওয়া হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ শিশুদের জন্য কি আমরা শপথ নিতে পারি যে, গ্রামীণ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত, আনন্দদায়ক ও মানবিক এক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হব। ■■

1838 সালে ব্রিটিশ সরকার প্রকাশিত উইলিয়ম অ্যাডম কর্তৃক প্রস্তুত Third Report on THE STATE OF EDUCATION in BENGAL সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বর্তমান শিক্ষা ও মানবিক শিক্ষার সন্ধানে: ফিরে দেখা

"আমাকে পণ্ডিত হতে বলো না পিসেমশাই"- রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকে অমলের সংলাপ থেকে মনে পড়েছে বর্তমান শিক্ষা কেবল পণ্ডিত হওয়ার জন্য, প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার জন্য নয়। মানুষ পড়াশোনা করে কেন? শুধু কি চাকরি পাবার জন্য? আর কি কোন লক্ষ্য নেই? যাঁদের আমরা মহাপুরুষ বলি তাঁদের জীবনী যদি আমরা ভালো ভাবে পড়ি, তাঁদের আদর্শ, তাঁদের দর্শনকে বোঝার চেষ্টা করি তবে আমরা শিক্ষার ভূমিকাটা কি বুঝতে পারবো। মনীষীগণ তাঁদের নানা উপদেশের মধ্যে দিয়ে নিজেদের জীবন সম্পর্কে নানান কথা বলেছেন। মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করে গেছেন, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সে পথ বন্ধ, তাঁদের সেই সমস্ত রচনা আজ বইয়ের পাতাতেই আটকে আছে; আজকের যুগে, আজকের সমাজে তার কোন মূল্যই কেউ দেয় না। বর্তমানে শিক্ষা বলতে বোঝায় পুঁথিগত বিদ্যা। আজকের শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রীক হয়ে পড়েছে। তারা আশেপাশের মানুষকে ভালবাসতে শিখছে না। শিক্ষা কি কেবল পরীক্ষায় পাশ করা, ভাল নম্বর পাওয়া? সবাই হয়তো বলবেন, অনেকেই তো এই ভাবে পড়াশোনা করেই বড় হচ্ছেন। পাঠ শেষ করে চাকরিও পাচ্ছেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই পাচ্ছে, কিন্তু তাঁদের জীবনদর্শনটা হারিয়ে যাচ্ছে।

আজকে সময় হয়েছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনকে জানবার, তাঁকে বোঝবার শিক্ষা সম্বন্ধে কি তাঁর দর্শন ছিল। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ডিগ্রী লাভান্তে চাকুরি লাভের মধ্যে শিক্ষার প্রয়োগ নয়। ব্যবহারিক জীবনের জন্য শিক্ষার দরকার। প্রচলিত শিক্ষা নীতিতে চিত্ত বা অন্তর সংস্কার হয় না। শিক্ষার দুটি ধারা আছে। যার প্রথমটি বিশুদ্ধ জ্ঞানের, দ্বিতীয়টি ব্যবহারিক। মনুষ্যত্বের বিকাশ, সৃজনশীলতা ও স্বাধীনতা এগুলি স্থান পায় প্রথমটির মধ্যে, আর জীবিকা প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি দ্বিতীয়টিতে অন্তর্ভুক্ত। তাঁর মতে সে শিক্ষাই হওয়া উচিত যা সত্যের জন্য, সুন্দরের জন্য, আনন্দের জন্য, ঢাক পিটানো শব্দের ডিগ্রী দেওয়া নয়। শিশু ও সংস্কৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "শিক্ষার দ্বারা মানুষের ভেতর থেকে ইতরতার বিষ-বীজ দূর করার জন্য প্রয়োজন" মানুষের ইতিহাসে যা কিছু ভালো তার সঙ্গে আনন্দময় পরিচয় সাধন, তার প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করবার সুযোগ ঘটিয়ে দেওয়া। মানুষের জীবনের বরণীয়টুকুর সঙ্গে মানুষের আনন্দময় পরিচয় সাধন তখনই সম্ভব যখন শিক্ষা শিক্ষার্থীর সুপ্ত নান্দনিক বোধকে জাগিয়ে তুলতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ এমন শিক্ষা-প্রণালীতে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন যা হবে ছাত্রদের সহজবোধ্য, উৎসাহব্যঞ্জক, হৃদয়স্পর্শী, জলচর জলে সাঁতার দিলে যেমন টের পাওয়া যায় না, তেমনই হবে শিক্ষাপ্রণালী।

আমাদের দেশ এক বিচিত্র দেশ। এখানে শিক্ষা নিয়ে কমিশনের পর কমিশন হয়, বিল হয়, আইন হয় তবু শিক্ষা তেমন গভীরতা পায় না ও প্রসারতা পায় না, চেতনাহীন হয়ে পড়ে। শিশু ও কিশোরের মধ্যে প্রতিভার সলতে আছে তাকে প্রজ্বলিত করে শিক্ষার লোডশেডিং-এ দীপাবলি পালন করা যায়।

আমাদের মনে রাখতে হবে বদ্ধ ক্লাস হচ্ছে প্রাণধর্মী চিত্তের সহজ জ্ঞানের পথে কঠিন বাধা, খাঁচার পাখিকে বাঁধা খোরাক খাওয়ানো যায় কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ পাখি হতে শেখানো যায় না।

শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "শিশুদের কাছে বিশ্ব খুব কাছে আছে। আমরা বয়স্করা সে কথা ভুলে যাই। এর জন্য কিছু নিয়মশৃঙ্খলার ছাঁচে তোলবার জন্য যখন তাকে জগৎ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের নিজের বানানো কলের মধ্যে বন্ধ করি তখন তাকে যে কতখানি বঞ্চিত করি তা নিজেরা অভ্যাস দোষে বুঝতেই পারি না। বিশ্বের প্রতি তার একান্ত স্বাভাবিক ঔৎসুক্যের ভিতর বোঝা যায়।" আমরা আওড়ে চলি শিক্ষা আনে চেতনা, আর চেতনা আনে বিপ-ব। কিন্তু কোথায় চেতনা, কোথায় বিপ-ব! বর্তমান শিক্ষার ফলে মানুষ শিক্ষার নিচে চাপা পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সেটাকে কোন মতে মঙ্গল বলতে পারি না। আমাদের যে শক্তি আছে তারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব - ইহাই শিক্ষার ফল। আমরা চলন্ত পুঁথি হইব, মাষ্টারমশাইদের সজীব নোটবুক হইয়া বুল ফুলিয়া বেড়াইব, ইহা গর্বের বিষয় নহে। আমরা জগতের ইতিহাসকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে সাহস করিলাম কই, আমরা রাজনীতিকে, অর্থনীতিকে নিজের স্বাধীন গবেষণা দ্বারা যাচাই করলাম কোথায়। আমরা কেবল

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই।

হায়! শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে। লজ্জিত না হই, এমনকী, আমরা ভুল করিলেও সংকোচ বোধ করিব না। কারণ ভুল করিবার যাহার নাই, সত্যকে আবিষ্কার করিবার অধিকারও সে পায় নাই।

সব শেষে যেটা বলা দরকার সেটা হচ্ছে দেশের মানুষ ও মাটির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। লোককথা, লোকগান, পালাগান, কীর্তন, যাত্রা এসবের মধ্যে দিয়ে মানুষ নানাভাবে শিক্ষালাভ করে এসেছে। এটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শিক্ষা যদি গ্রামের মানুষের মনের খোরাক যোগাতে পারে তবেই প্রকৃত শিক্ষা হয়ে উঠবে। না হলে মানুষ হবে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কলের মানুষ, অর্থাৎ যন্ত্রমানুষ যা পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবনের উদ্দেশ্য থেকেই খুঁজে বার করা দরকার, সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের জীবন যেমনভাবে যাপন করে সেখান থেকেই তারা খুঁজে পায় তাদের জীবনের উদ্দেশ্য। কোন দার্শনিক বা তাত্ত্বিকের হাত ধরে পায় না। মনে রাখতে হবে, শিক্ষা হল ব্যক্তির সামাজিকীকরণের এক জরুরী দিক। পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ সমভাবে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধন করতে হবে। মানুষের জীবনে মূল্যবোধ গড়ে তোলারই এক প্রক্রিয়া হল শিক্ষা আর সেই লক্ষ্যে এগিয়ে দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষা সামাজিক দুর্গতির দিকে নজর দেয়। চিকিৎসকের দায়িত্ব যদি হয় অসুস্থ ব্যক্তির রোগ নিরাময় এবং রাজনীতিবিদদের দায় যদি হয় গোষ্ঠীর সমাজ শরীরের সুঠাম ব্যবস্থাপনা, তাহলে শিক্ষককেও সমাজের চিকিৎসাবিদ হিসাবেই দেখতে হবে। কিন্তু চিকিৎসক ও রাজনীতিবিদদের প্রধান কাজ হল রোগের প্রতিকার আর শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিতভাবে প্রতিষেধকের। ডাক্তারবাবু ও রাজনীতি বিশারদদের কাজ হল বর্তমান নিয়ে সমস্যা যেমন যেমন দেখা দিচ্ছে তেমন তেমন তার ব্যবস্থা করা। শিক্ষাদাতার চোখ ভবিষ্যতে নিবদ্ধ, সমস্যা ও সংকট যাতে আদৌ দেখা না দেয় তাঁকে তার জন্যই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এই হল প্রকৃত শিক্ষা, প্রকৃত মানবিক শিক্ষার সন্ধান, এরই সন্ধানে আমাদের প্রতিনিয়ত নিয়োজিত থাকতে হবে।

"খালি বই পড়া শিক্ষা হইলে চলিবে না। যাহাতে চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে-এই রকম শিক্ষা চাই।"

- স্বামী বিবেকানন্দ

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক গঠন

আমাদের আধুনিক সভ্যতার বাস্তব কাজকর্ম এত জটিল হয়ে উঠেছে এবং উন্নত প্রযুক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞান দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে যে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বাস্তব কাজকর্ম পরিচালনার জন্য এক ধরনের বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে নিজস্ব একধরনের স্কুল গড়ে তোলার প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা জীবনাদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না, বরং শিক্ষাকে জীবন প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হতো। তখন শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য, ব্যক্তির মধ্যে আত্মিক বোধ জাগ্রত করা। সেই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল দ্বিমুখী। শিক্ষার্থীর আত্মোপলব্ধি (Self-Realisation) এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ (Spiritual Development)। আর বর্তমানে গড়ে উঠেছে এমন স্কুল যা বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক চাহিদা মেটায়। তার ফলে মূল্যবোধের সংকট দেখা দিয়েছে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সবাই টাকা পয়সা দিয়ে জগৎকে মাপছে। মানুষ হয়ে উঠেছে আত্মকেন্দ্রিক, সে নিজেকে নিয়েই সব সময় ব্যস্ত। তাহলে পথ কোথায়? এখন ক্লাসের ভেতরে একটা কাজ হয়, যেটাকে বলা হয় Within Class Activities অর্থাৎ ক্লাশের ভিতরের কাজ এছাড়া আর একটা কাজ আছে সেটা হল Out of Class Activities, অর্থাৎ ক্লাসের বাহিরের কাজ। সেটা কি? সেটা হচ্ছে নানা রকমের সৃজানাত্মক কাজ যেমন গল্প, কবিতা-আবৃত্তি, ছবি আঁকা, নাটক, গান, খেলাধুলা, ব্যায়াম এগুলোর মধ্যে দিয়ে যেমন আনন্দ হয় তেমনিই বৌদ্ধিক এবং মানসিক বিকাশ হয়। পাশে ছক দেওয়া হল।

শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক, নৈতিক, আত্মিক/আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশে সহায়তা করবে। বর্তমানে যে শিক্ষা সেটা হচ্ছে শিক্ষা মানবসম্পদ, বস্তুগত সম্পদ উন্নয়ন, জাতীয় বিকাশ (GNP)। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র জ্ঞান আহরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীকে সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়তা করা (All Round Development)। সর্বাঙ্গীন বিকাশ বলতে শুধুমাত্র বৌদ্ধিক বিকাশ (Intellectual Development) নয়। অন্যান্য শিক্ষার্থীর মানসিক, ও দৈহিক আবেগ এবং সামাজিক, আত্মিক/আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও পেশাগত ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের বিকাশ হতে হবে। অর্থাৎ বৌদ্ধিক বিকাশের (Intellectual Development) সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলা, অভিনয়, নাচ-গান, ছবি আঁকা, বিতর্কসভা এইগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত পরিশ্রম সংক্রান্ত কার্যাবলী, (Extra Curricular Activities)। আমরা মনে করি, শিক্ষালয়ের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে বৈচিত্র্যে এনে শিক্ষার্থীর মনের একঘেয়েমি ও বিরক্তিকর অনুভূতি দূর করা দরকার। অর্থাৎ আনন্দের একটা পরিবেশ এবং মানসিক এক প্রফুল-তার জায়গা তৈরী করা দরকার। শিক্ষা তখনই মানবিক হবে যখন সার্বিক জীবন বিকাশের জন্য লক্ষ্য রেখে হবে, আর এই জীবন বিকাশ সংগঠিত হবে প্রত্যক্ষ জীবন যাপনের মাধ্যমে। ■■

শিক্ষা তখনই মানবিক হবে যখন সার্বিক জীবন বিকাশের জন্য লক্ষ্য রেখে হবে, আর এই জীবন বিকাশ সংগঠিত হবে প্রত্যক্ষ জীবন যাপনের মাধ্যমে।

ক্লাসঘরের বাহিরের কাজ

মূল শ্রেণী	উদ্দেশ্য	কাজের সাধারণ প্রকৃতি	কার্যাবলী
শরীরচর্চামূলক	দৈহিক ও মানসিক বিকাশ	ব্যায়াম, খেলাধুলা	বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রিত দেহ সঞ্চালন, ফুটবল, খোখো, এক্কাদোক্কা ইত্যাদি
বিশেষ শিক্ষামূলক কার্যাবলী	বৌদ্ধিক, মানসিক বিকাশ ও জ্ঞানের সম্প্রসারণ ও নৈতিক বিকাশ	সৃজানাত্মক কাজ ও রসোপলব্ধিমূলক কাজ	আবৃত্তি, কবিতা-সভা, গান-নাচ, অভিনয়, সাহিত্যসভা,গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা, ছবি আঁকা, হাতের কাজ
সমাজশিক্ষামূলক	সামাজিক বৌদ্ধিক বিকাশ	সমাজ-প্রশাসনমূলক কাজ	স্বায়াত্তশাসন ব্যবস্থা জানা, সমাজ উন্নয়ন মূলক কর্মসূচি
বৃত্তিশিক্ষামূলক	উপার্জন করার ক্ষমতার বিকাশ	হাতে কলমে কাজ শেখা	পুষ্টি বাগান, নার্সারী করা, গাছের কলম করা, ঝুড়ি বোনা ও গ্রামের জীবন জীবিকায় যে সকল জিনিস লাগে

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের উন্নয়নের নতুন পথের খোঁজে

কী করলে সমাজের সব মানুষের ভালো হবে, মঙ্গল হবে, সুখ শান্তি থাকবে তথা সামাজিক উন্নয়ন হবে - তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছে, হয়তো চলতে থাকবে। সঠিক উন্নয়নের পথটা চেনা অত্যন্ত জরুরী এই মুহূর্তে। তাই উন্নয়নের প্রশ্নে অতীত ও বর্তমানকে নিয়ে যদি একটু ভাবি তাহলে বোধহয় ভবিষ্যতের একটা পথ বেরতে পারে। এখন আমরা যে উন্নয়নের মডেলটা দেখি সেটা পশ্চিমি ধাঁচে উন্নয়ন, এটা একটা মডেল বলে অনেক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞের মনে হয়েছে। এই মডেলে বর্তমানে যে উন্নয়ন দেখি, মনে হয় তা একটা চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপার।

চলতি উন্নয়ন ধারণাটা যতই আপাত বিশ্বাসযোগ্য হোক না কেন, এর থেকে সব মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়নি, হবেও না। ওপরতলার কিছু সংখ্যকই এর দ্বারা লাভবান হবে বা হচ্ছে, বাদবাকিরা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে যাচ্ছে। এই উন্নয়নের মূল্যবোধটা ভোগের খাতে বয়ে যায়। যেমন এখন মানুষ চায় উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা, উন্নত উপার্জন ব্যবস্থা, উন্নত পথঘাট ইত্যাদি এই সূত্র ধরেই পশ্চিমি মডেলের উন্নয়ন ঢুকে পড়ে পৃথিবীর দেশে দেশে।

উন্নয়নটা যাদের জন্য বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ, তারা কিন্তু আদৌ জানেন না উন্নয়ন কি জিনিস, তাদের জীবনে তার ভূমিকা কি? উন্নয়ন কর্তারা তাঁদের খোজঁও নেন না। কিসে তাদের উন্নতি ঘটবে তাও জানতে চান না। উন্নয়নের যারা নীতি নির্ধারণ করেন তাদের কাছে উন্নয়ন একটা পয়সাকড়ির ব্যাপার, জীবিকা এবং ক্ষমতার উৎস হয়ে ওঠে। এটা হয়ে যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা আকাঙ্খা পূরণের উপায়, উচ্চবিত্তে পরিণত হওয়ার দিকে এগোনো। এরা ভেবে দেখেন না আঞ্চলিক সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য-পরম্পরা, জ্ঞান, উৎপাদন কৌশল কী চালু আছে সমাজে, আর সেগুলো লোপাট করে দেওয়াই যেন বর্তমান উন্নয়নের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

উন্নয়ন-প্রতিষ্ঠান আর উন্নয়ন-পেশাদার বিশেষজ্ঞদের কব্জায় উন্নয়ন বাঁধা, সেখানে সাধারণ মানুষ নীরব দর্শক। সাধারণ মানুষের ইচ্ছা, তাদের আবেগ, কোন ধরনের উন্নয়ন হলে অঞ্চলের ভালো হবে এসবের কোন ভূমিকা নেই। কী হলে সমাজের মঙ্গল হবে তা নিয়ে উন্নয়ন-সংগঠন, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, বেসরকারি সংগঠন (NGO) কেউ ভাবে না। উন্নয়নের নামে মধু খাচ্ছে উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত লোকেরা। এটা তাদের ক্ষমতার উৎসও বটে এবং তারা অর্থ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করে আছে।

আমাদের উন্নয়নের চিন্তাটা স্থানীয় সমস্যার আধারে কোনদিনই গড়ে ওঠেনি। পশ্চিমের প্রয়োজনে, পশ্চিমের আদর্শে ও আগ্রহে উন্নয়ন-চিন্তা বিকশিত হয়েছে। পশিমী শিক্ষায় শিক্ষিত উন্নয়ন কর্তাদের মনে হয়েছে আমরা তাদের মতো নয়। আমাদের তাদের মতো করতে হবে। তাদের উন্নয়ন মডেলটাই ঠিক। সারা পৃথিবীকে এই মডেল অনুসরণ করতে হবে।

আমরা যেন ভুলে না যাই যে এই মডেল মূলতঃ ভোগকেন্দ্রীক এবং যার পয়সা আছে তার জন্য অফুরন্ত সুযোগ সাজানো আছে। মনে রাখতে হবে, যদি প্রথম বিশ্ব ইউরোপ এবং আমেরিকা যে পরিমাণ ভোগ করে সেই পরিমাণ ভোগের পিছনে যদি বিশ্বের সকলে ছুটতে থাকে তাহলে

এই পৃথিবীর মতো আরও দুটো পৃথিবী লাগবে, তা কি সম্ভব?

এই উন্নয়ন আদতে শহরকেন্দ্রীক চোখ ধাঁধানো মডেল। এই মডেলে গ্রামীণ কৃষ্ঠি, সংস্কৃতি কোণঠাসা, বিপর্যস্ত। সবাই একভাবে এবং ভোগ বিলাসের সুরে কথা বলছে, ভাবছে। আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার অর্থ এসব কিছু নিয়ে, আমি একাই থাকব। নিজের মতো ভোগ করব। তাইতো যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে।

মনে রাখতে হবে গ্রামে একটা সাংস্কৃতিক চৌহদ্দি আছে। গ্রামবাসী সেই চৌহদ্দির সীমানা জানে। ওপর থেকে উন্নয়ন চাপিয়ে দিলেই গ্রামের তথা সমাজের উন্নতি হবে না। এর ভেতরের সমস্যা বুঝতে হবে।

গ্রামের একটা নিজস্ব শাসনব্যবস্থা চালু ছিল, গ্রাম ষোল আনা। ওপর থেকে একটা পশ্চিমি মূল্যবোধের প্রাতিষ্ঠানিক শাসন চালালে গ্রামীণ সমাজের নিজস্ব যে একটা স্ব-শাসনের ভূমিকা আছে সেটা অমান্যই করা হবে। তা দিয়ে সমাজে কখনো সব মানুষের মঙ্গল হতে পারে না। সব মানুষ উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও যুক্ত হতে পারে না। তাই আমরা একটু অতীতের দিকে ফিরে গিয়ে একটু চিন্তা করি এবং যেসব মনীষীরা গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন নিয়ে ভেবেছেন, কিছু কাজও করে গেছেন, নতুন পথ দেখিয়েছেন তারা কী বলেছেন সেটা দেখি। তার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় একদিন ভারতের সমাজটাই ছিল প্রধানতঃ পল-ীসমাজ। পল-ীসমাজে ব্যক্তি সম্পত্তির সঙ্গে সামাজিক সম্পত্তির সামঞ্জস্য ছিল। ধনী আপনার ধন সম্পূর্ণ আপন ভোগে লাগাতে অগৌরব বোধ করত। ধনীর স্থান ছিল সেখানেই, যেখানে ছিল নির্ধন, সেই সমাজে আপন স্থান মর্যাদা রক্ষা করতে গেলে ধনীকে নানা পরোক্ষ আকারে বড়ো অঙ্কের খাজনা দিতে হত। গ্রামের বিশুদ্ধ জল, বৈশ্য, পণ্ডিত, দেবালয়, যাত্রা, গান, পথঘাট সমস্তই রক্ষিত হত গ্রামের ব্যক্তিগত অর্থের সমাজমুখীন প্রবাহ থেকে, রাজার থেকে নয়। এর মধ্যে স্বেচ্ছা ও সমাজের ইচ্ছা দুটোই মিলেছিল।

এই যে আদান প্রদান চলত, রাষ্ট্রীয় যন্ত্র যোগে নয়, মানুষের ইচ্ছার মধ্যে এটা ছিল। ব্যক্তিগত অন্তরের দিক থেকে যে সাড়া মিলত সেটাই স্থায়ী উন্নয়নের মানবিক ধাপ ছিল। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ছিল প্রধানতঃ সামাজিক দানে ও কর্মে, এখন হয়েছে ব্যক্তিগত ভোগে। রবীন্দ্রনাথ আর যে কথাটা বলেছেন সেটা হচ্ছে "মানুষের অধিকার চেয়ে নিতে হবে না, অধিকার সৃষ্টি করতে হবে, কেননা মানুষ প্রধানতঃ অন্তরের জীব, অন্তরেই সে কর্তা, বাহিরের লোভে অন্তরের লোকসান ঘটে, অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার দুঃখভার আমাদের পক্ষে তেমন বোঝা নয়, বোঝা আমাদের মাথার উপরে"। এখন রাষ্ট্র, যাকে আমরা সরকার বলি, তার দানের উপর আমরা বসে আছি। আবেদন নিবেদনের থালা যা আমরা পেতে বসে আছি রাষ্ট্রের কাছে, রাজনৈতিক দাদাদের কাছে, বেসরকারী সংগঠন (NGO)-দের কাছে।

আমাদের আত্মশক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে, এটাই উন্নয়নের ভিত। বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে লালন অবধি সাধু সাধক যাঁরাই এসেছেন পৃথিবীতে কোন মহাবার্তা নিয়ে, তাঁরা সকলেই যান্ত্রিক বাহ্যিক আচারের বিরোধী, তাঁরা সব বাধা ভেদ করে কথা কয়ে ছিলেন মানুষের অন্তরাত্মার সাথে। তাঁরা কৃপণের মতো, হিসেবে বিজ্ঞ লোকের মতো এমন কথা বলেননি যে, আগে বাহ্যিক, তারপরে আন্তরিক, আগে অন্ন, বস্ত্র, টাকাকড়ি তার পরে আত্মশক্তির পূর্ণতা। পশ্চিমি মডেল অনুসরণ করে যে বিপদ আমরা ডেকে এনেছি তা হল এই যে, দেশের লোকের কাছে কিছু চাইলে আর সাড়া পাওয়া যায় না। জলদান, অন্নদান, বিদ্যাদান সমস্তই সরকার বাহাদুরের মুখের দিকে তাকিয়ে। এইখানে দেশ গভীরভাবে আপনাকে হারিয়েছে। দেশের লোকের সঙ্গে দেশের সম্পর্ক যথার্থ সেবার; সেখানেই ঘটেছে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ।

স্বধর্মের আকর্ষণে মানুষ এই যে অনেকে এক হয়ে বাস করে, তারই গুণে প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের শান্তির ফল লাভ করে। তাঁর মতে "চার পয়সা খরচ করে কোন মানুষ একলা নিজের শক্তিতে একখানা সামান্য চিঠি চাটগাঁ থেকে কন্যাকুমারীতে কখনই পাঠাতে পারতো না।" ---যে সকল ক্ষেত্রে সমাজের সকলে মিলে প্রত্যেকের হিতসাধনের সুযোগ আছে সেখানেই সকলের ও প্রত্যেকের কল্যাণ। সমাজের উন্নয়ন তখনই হবে যখন অনেকে মিলে মনের যোগে কাজ করতে পারবে। মানুষের ধর্মই এই যে, সে অনেকে মিলে একত্রে বাস করতে চায়। একলামানুষ কখনোই পূর্ণ মানুষ হতে পারে না। অনেকের যোগে তবেই সে নিজেকে ষোলআনা পেয়ে থাকে। দল বেঁধে থাকা, দল বেঁধে কাজ করা মানুষের ধর্ম বলেই সেই ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পালন করতে মানুষের কল্যাণ, তার উন্নতি।

বর্তমানে উন্নয়ন যে পথে ছুটে চলেছে তাতে সব মানুষই একটা জায়গায় বাঁধা পড়েছে অর্থোপার্জনের কাজে। এইখানেই মানুষের লোভ তার সামাজিক শুভবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে চলে যায়।

ধনে বা শক্তিতে অন্যের চেয়ে আমি বড়ো হব, এই কথা যেখানেই বলেছে সেখানেই মানুষ নিজেকে আঘাত করেছে। কেননা কোনো মানুষ একলা নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ নয়। সত্যকে যে আঘাত করা হয়েছে তার প্রমান এই যে, অর্থ দিয়ে, প্রতাপ নিয়ে মানুষে মানুষে যতই লড়াই ততই প্রবঞ্চনা। অর্থোপার্জন, শক্তি-উপার্জন যদি সমাজভুক্ত লোকের পরস্পরের যোগে হতে পারত তাহলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই সকল ব্যক্তির সম্মিলিত প্রয়াসের প্রভূত ফল সহজ নিয়মে লাভ করতে পারত। জনকল্যাণের দাবি হচ্ছে ব্যক্তিস্বার্থের দাবির বিপরীত এবং ব্যক্তিস্বার্থের দাবির চেয়ে উপরের জিনিস। আর আমাদের ভারতবর্ষে সমাজের শাসন প্রবল, রাষ্ট্র তার নিচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা, এমনি করেই অন্ন-বস্ত্র, ধর্মকর্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে। এ দেশ ছিল দেশের লোকের, রাজা ছিল অংশ মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি।

পাশ্চাত্য রাজার শাসনকালে এইখানে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে। গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যপ্ত ছিল রাজশাসন তাকে অধিকার করল। এখানেই শেষ হল সমাজের শাসন। এমন গ্রাম ছিল না যেখানে সর্বজন সুলভ্য প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালা ছিল না। গ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তিদের চণ্ডীমণ্ডপগুলি ছিল এই সকল পাঠশালার অধিষ্ঠান স্থল। চার-পাঁচটি গ্রামের মধ্যে অন্তত একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। যার ব্রত ছিল বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদান করা। সমাজধর্মের আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষার ভার তাঁদের উপরেই ছিল। তখনকার ভোগ একান্ত সংকীর্ণভাবে ব্যক্তিগত ছিল না। তেমনি জ্ঞানীর জ্ঞানভান্ডার সকলের কাছে অবারিত ছিল। গুরু শুধু *শেষাংশ ছয় পাতায়*

সাক্ষাৎকার

"শিক্ষার উদ্দেশ্যটাই গ্রামের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। আমি যদি গ্রামের কোন ছেলেমেয়েকে জিজ্ঞাসা করি - তুমি যে লেখাপড়া শিখলে, তুমি চাষ করতে পারো? সজীবাগান করতে পারো? তুমি তোমার জামাটা বানাতে পারো? উত্তর আসবে - "না" । তুমি যে জায়গাটাতে থাকবে সেটা কি তুমি বানাতে পারো? "না" , অর্থাৎ এমন শিক্ষায় শিক্ষিত হয় খাদ্য, কাপড়, চাষবাস, বাসস্থান যেটার জন্য এই জীবনযাপন সেই আনন্দ করার সৃষ্টি করার জায়গাতেই পৌঁছাতে পারলো না"। — নবদিশার প্রতিনিধি শ্রী স্বপন দাস মহাশয়কে এক সাক্ষাৎকারে বললেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাঠক্রম পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য শিক্ষক শ্রী দেবাশীষ মন্ডল ।

প্রশ্নঃ শিক্ষক হিসাবে আপনার অনেক বছরের অভিজ্ঞতা। আপনার কি মনে হয় বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার বিষয়বস্তু অনেকটাই শহরকেন্দ্রীক, প্রত্যন্ত গ্রামের অবস্থা অনুসারে অপ্রাসঙ্গিক?

উত্তরঃ দেখুন বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু অনেকটাই শহরকেন্দ্রীক। এর ফলে গ্রামের ছেলেরা আর গ্রামে থাকছে না। গ্রামের সম্পদকে ব্যবহার করছে না। গ্রামের প্রতি তার আর কোন মায়া মমতা নেই। এই যে ধারণাগত পদ্ধতিটা একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামের লেবেলে দিতে পারছে না এই শিক্ষাব্যবস্থা। আর তার ফলে ছেলে-মেয়েদের মূল্যবোধটাও পাল্টাচ্ছে। তাদের অভিভাবকরাও ভাবছে যে, "আমি লাঙল ঠেলে যে কষ্ট করেছি, আমার ছেলে চাষি না হয়ে বড় হয়ে টাই পরে ঘুরে বেড়াবে"। অর্থাৎ বৈষম্য। এটা এতটাই প্রকট করে দিয়েছে যে নিজস্ব আত্মসম্মান বোধটাকে তারা হারিয়ে ফেলেছে। আর এই ধরনের জায়গা থেকে মানুষের মধ্যে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত আসছে যে, "আমি যা কষ্ট করেছি আমার সন্তান যেন না করে"।

শিক্ষার উদ্দেশ্যটাই গ্রামের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। আমি যদি গ্রামের কোন ছেলেমেয়েকে জিজ্ঞাসা করি - তুমি যে লেখাপড়া শিখলে, তুমি চাষ করতে পারো? সজীবাগান করতে পারো? তুমি তোমার জামাটা বানাতে পারো? উত্তর আসবে - "না"। তুমি যে জায়গাটাতে থাকবে সেটা কি তুমি বানাতে পারো? "না", অর্থাৎ এমন শিক্ষায় শিক্ষিত হয় খাদ্য, কাপড়, চাষবাস, বাসস্থান যেটার জন্য এই জীবন যাপন সেই আনন্দ করার সৃষ্টি করার জায়গাতেই পৌঁছাতে পারলো না।

গ্রামীণ ছেলে মেয়েদের গ্রাম্য পরিবেশে দাঁড়িয়ে যে বিকাশ হবার কথা সেটাও হচ্ছে না। বর্তমানে গ্রামের বাবা মায়েরা আশা করে যে পড়াশোনা করলে বিদ্যা-বুদ্ধি প্রচুর হবে এবং শহরে বড় চাকরি করে প্রচুর টাকা রোজগার করবে। সেটা করতে গিয়ে দেখা গেল মূল্যবোধের একটা বড় অবক্ষয় ঘটে গেছে। মূল্যবোধের যদি অবক্ষয় ঘটে থাকে তাহলে শিক্ষার কি প্রয়োজন?

প্রশ্নঃ তার ফলেই কি গ্রামের গরীব পরিবারের ছেলেমেয়েদের স্কুলছুট হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে?

উত্তরঃ এটা একটা বড় কারণ। আসলে এতদিন ধরে আমাদের শিক্ষার বিষয়বস্তু যেটা হয়ে আসছে সেটা হচ্ছে বইকেন্দ্রীক। ধরুন আমি বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে ভালবাসি। আমাকে যদি কেউ "ওথেলো" পড়তে চাপ দেয় আমি দু'চার লাইন পড়ব তারপরে আমি পড়ব না আর আমার মনেও থাকবে না। আমি তো আর মন থেকে পড়ছি না আমাকে চাপ দিয়েছে বলে পড়ছি।

ছোট করে একটা গল্প বলি। আমি খেলেধূলে পড়তে বসেছি। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছি। মা ভাবছে আমি খুব পড়ছি। ছেলে কি পড়ছে ছেলে জানে না। কেন জানে না? কারণ আমার বইয়ের ভাষা, আমার ভাবনা ও চিন্তার সঙ্গে আমার পরিবেশের সঙ্গে বইয়ের ভাবনার, চিন্তার, পরিবেশের মধ্যে কোন মিল নেই অর্থাৎ এইখানে এমন একটা ফাঁক তৈরী হয়ে যাচ্ছে যে বইয়ের বিষয়ের সঙ্গে কোথাও কোন সম্পর্ক নেই। এই সম্পর্ক নেই যে জায়গাটা সেই জায়গাটাতেই আমাকে সম্পর্ক তৈরী করতে বলা হচ্ছে জোর করে। এই জোর যখনি ব্যবহার করা হচ্ছে তখন ক্রমশ গ্রামের ছেলেমেয়েরা আরো আরো দূরত্বে চলে যাচ্ছে। সেটা তাদের বাবামায়েরাও টের পাচ্ছে না। ফলে বইয়ের ভাষা, স্কুলের চাপ, বাবা মায়েদের চাপ, সমাজের একটা চাপ সব মিলিয়ে মিশিয়ে শিক্ষার প্রক্রিয়াটা এমন একটা জায়গায় গ্রামের বাচ্চাদের পৌঁছে দিচ্ছে যে ছেলেমেয়েরা শিক্ষার প্রক্রিয়া থেকে ক্রমশ দূর থেকে আরো দূরে চলে যায়। ফলে তাদের স্কুলছুটের পাল-টা বেশী ভারী হয়ে ওঠে।

প্রশ্নঃ এলাকা অনুযায়ী কি আঞ্চলিক বিষয়বস্তুর প্রয়োজন আছে?

উত্তরঃ অবশ্যই। প্রত্যেকটা অঞ্চলের নিজস্ব কিছু চরিত্র আছে। সেই চরিত্রটাকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে। তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। ধরুন আমি থাকি বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রামে। যদি আমি কোলকাতার চরিত্রটার দিকে যাই যার সঙ্গে আমার শারীরিক, মানসিক, প্রকৃতিগত কোন যোগ নেই।

তাহলে তো শিক্ষা সম্পূর্ণ হলো না। আঞ্চলিক বিষয় সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমার *শেষাংশ পরের পাতায়*

লোকায়ত সংস্কৃতির নবীকরণের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা ভাবনা

"শিক্ষা বলিতে কতগুলি শব্দ শিক্ষা নহে; আমাদের বৃত্তিগুলির শক্তি সমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে।" -স্বামী বিবেকানন্দ

বর্তমানে আমরা যে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আছি তা মূলতঃ উনিশ শতকের গোড়াতেই ইংরেজ শাসকদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল। এদেশের উপর ব্রিটিশ অধিকার কায়েম রাখার জন্যই ইংরেজি শিক্ষার চালু করা হয়।

দেশজ যে শিক্ষাধারা আমাদের ছিল তার একেবারে খোলনলচে পালটে পুরোপুরি পশ্চিমি মডেলে এদেশে শিক্ষার প্রসার চেয়ে ছিলেন গ্রান্ট, মেকলে । এজন্য তারা চেয়ে ছিলেন ইংরেজি ভাবে ভাবিত ও অনুগত এক শ্রেণীর প্রজা তৈরী করতে যারা এদেশে ইংলন্ডের স্বার্থ বজায় রাখতে বিশেষ ভূমিকা নেবে।

ইংরেজি শিক্ষা আমাদের এতখানি মজ্জায় ঢুকে গেছে যে আমাদের একটা দেশজ লোকায়ত শিক্ষাধারা ছিল সে কথা আমরা ভুলেই গেছি। প্রশ্ন উঠতে পারে তাতে কি কোন ক্ষতি হয়েছে? ক্ষতি যে হয়েছে এ বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? মানুষের সম্পর্কগুলো ঠুনকো হয়ে গেছে, আত্মকেন্দ্রিক হয়েছে মানুষ, অর্থনৈতিক মানুষ হিসাবে নিজেকে ভাবছে। জীবনযাপনে মূল্যবোধের ভাঙন দেখা দিচ্ছে। সমাজের প্রতি কোন দায় নেই। আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই, সব এক ধাঁচে বাঁধা। এক ঘেয়েমি সিলেবাস, ছাত্রছাত্রীরা কোন আনন্দ পায় না, ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই।

এ যেন পরীক্ষা, ডিগ্রি শেষে চাকরি, কারণ মানুষ যা জানতে চায় ও শিখতে চায় তার সাথে কোন মিল নেই। তার ফলস্বরূপ আজকে আমরা গ্রামবাংলায় দেখি যুবকরা নিজেদের গ্রাম ছেড়ে স্থানীয় এলাকা ছেড়ে শহরে পাড়ি জমায়। কারণ ছেলেমেয়েরা যা শিখছে তার বাস্তব প্রয়োগ গ্রামে নিজেদের এলাকায় করা সম্ভব নয়।

নিজেদের সমাজের চিরাচরিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নাকি পরীক্ষায় ভালো ফল করা? কোনটা গ্রহণ করবে এনিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মনে সংশয়ও দেখা দিচ্ছে। যদি আমরা নতুন পথ না বার করতে পারি তাহলে গ্রামসমাজের বাঁধন আরও আলগা হবে। পণ্য-অর্থনীতির বাঁধনে বাঁধা যে সমাজ আজকে আমাদের সম্পর্কগুলো নষ্ট করে দিচ্ছে সেখানে আত্মীকরণের একটা চেষ্টা চালাতেই হবে আর সেই চেষ্টা চালাতে গেলে লোকায়ত সাংস্কৃতির নবীকরণের মধ্যে দিয়েই এ পথের সন্ধান আমরা পেতে পারি। কীভাবে পেতে পারি তার একটা দিশা আমরা তুলে ধরেছি। বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের বাহিরে অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকের পড়াশোনার বাইরে ছাত্রছাত্রীদের আনন্দ ও সৃজনাত্মক বিকাশের জন্য খেলাধূলা, কবিতা, নাটকচর্চা, গানবাজনা, ছবিআঁকা, বিতর্কসভা এগুলো হতে পারে। হতে পারে পঞ্চম শ্রেণী থেকেই ছাত্রছাত্রীরা গ্রামের যে স্বশাসিত ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ পঞ্চায়েতি রাজ, সেটা জানতে পারে বাল পঞ্চায়েত গঠনের মাধ্যমে। গ্রামের যে চাষ ব্যবস্থা আছে হাতে কলমে শিখতে পারে অর্থাৎ ভোকেশনাল পেশাগত কাজ শেখা, তাহলে অন্ততঃ ছাত্রছাত্রীরা গ্রামের মাটি, বীজ, গ্রামের সম্পদকে বুঝতে শিখবে। স্থানীয় সংস্কৃতির চর্চা করবে, গ্রামের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের একটা নাড়ির টান তৈরী হবে। শহরের দিকে তাদের আকৃষ্ট হওয়া অনেকাংশে কমে যাবে এবং তাদের জীবনের চলার পথ তারা নিজেদের মাটিতে দাঁড়িয়ে আঞ্চলিক সংস্কৃতির উপর ভিত করে জীবনযাপনের একটা আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করতে পারবে। স্বামী বিবেকানন্দের কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে- খালি বই পড়া শিক্ষা হলেই হবে না, যাতে চরিত্র গঠন হয় মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এই রকম শিক্ষার প্রয়োজন।

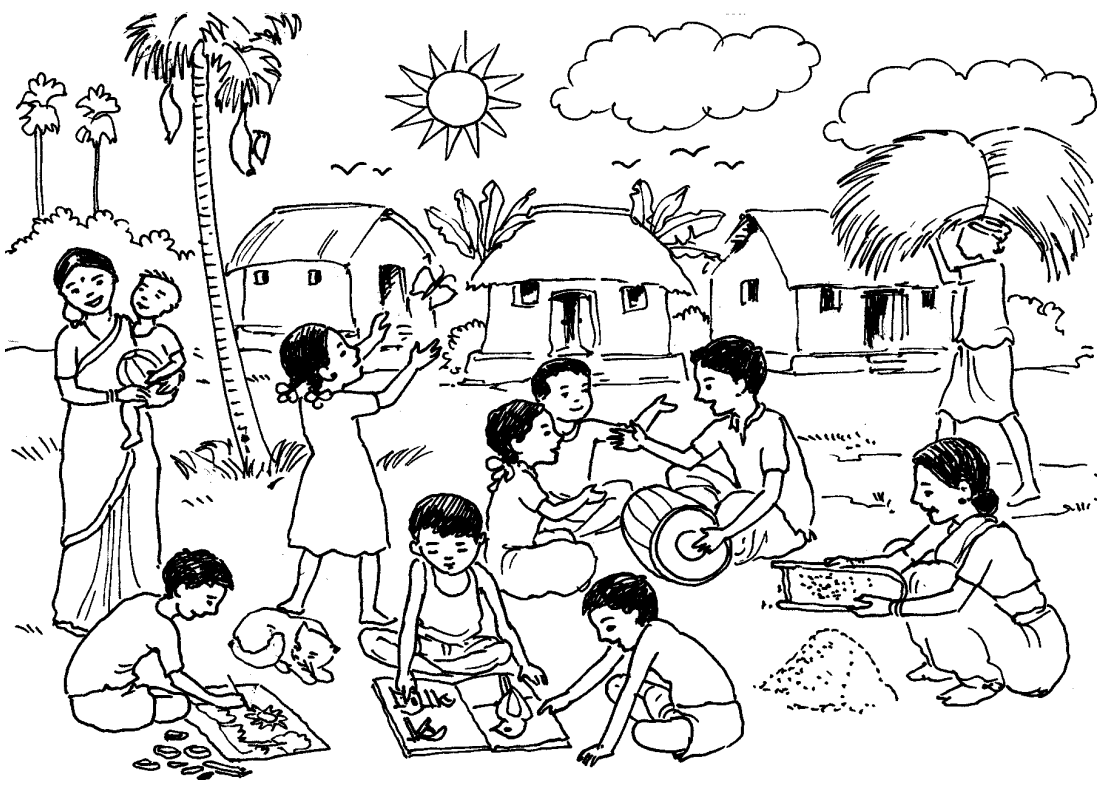

সাক্ষাৎকার... *৫ পাতার শেষাংশ*

মধ্যে জন্মাল না।

অর্থাৎ আমার গ্রাম। আমার পরিবার, আমার পরিবেশ ও আমার অঞ্চলের জ্ঞান, সংস্কৃতি, কিছুই জানলাম না। তাহলে কি আমরা কিছু শিখতে পারলাম। তাই প্রয়োজন আঞ্চলিক বিষয়বস্তুকে জানা, পরিবেশকে জানা। সেইটার ওপরই আমরা এখন জোর দিচ্ছি - ২০০৫ সালে যে জাতীয় কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক হয়েছে তাকেই কেন্দ্র করে সেটাকে মনে রেখে ২০১৩ থেকে চালু করতে চলেছি।

আঞ্চলিক বিষয়কে জানা। বইকেন্দ্রীক শিক্ষা বা স্কুল ঘরের মধ্যে শুধু আবদ্ধ শিক্ষাই নয়। স্কুলের বাইরে হাতে কলমে কাজ করতে করতে গ্রামের উপযোগী বা অঞ্চলের উপযোগী বিষয়বস্তু শেখার মধ্যে দিয়েই ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হবে। অর্থাৎ যাতে ব্যবহারিক জীবনে শিক্ষাটা কাজে লাগে এবং আনন্দ পায়।

প্রশ্নঃ যদি তাই হয় তাহলে কি গ্রাম পঞ্চায়েতরা গ্রামের বিভিন্ন দক্ষব্যক্তি ও পরামর্শদাতার সহায়তা নিয়ে কার্যক্রম স্থির করতে পারবে?

উত্তরঃ নিশ্চয়ই পারবে। তবে এর একটা সঠিক দিশা দরকার। পরামর্শদাতা ও দক্ষব্যক্তিরা যাদেরকে পঞ্চায়েত এই কাজে ব্যবহার করবে। তাদের একটা পরিকল্পনা এবং চিন্তাভাবনা দরকার কী শেখাব কীভাবে শেখাব সেটা যদি জানা থাকে তাহলে না হওয়ার কারণ দেখিনা। পরিকল্পনা এবং চিন্তাভাবনা ছাড়া সঠিক দিশা দেখানো অসম্ভব। আমি আমার মতো করে দিশা দেখাতে পারি, এখন সেই দিশাটা সঠিক জায়গায় সঠিকভাবে পৌঁছচ্ছে কিনা সেইটা তাদেরকে বুঝতে হবে। সেটা যদি তারা পারেন খুব সহজেই তারা স্থির করতে পারবেন।

প্রশ্নঃ আপনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরে সিলেবাস কমিটির পরামর্শদাতা হিসাবে আপনার কি মনে হয় - অঞ্চলভিত্তিক সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বিভিন্ন জ্ঞান ও দক্ষতা আছে আপনারা যে নতুন বিষয়বস্তু ও পাঠক্রম তৈরি করেছেন সেখানে দেশীয় অঞ্চলের জ্ঞানটা আগামী প্রজন্ম যাতে পায় সেই রকম সুযোগ কি নতুন বিষয় বস্তুতে থাকছে?

উত্তরঃ খুব ভালো প্রশ্ন। শিক্ষার বিষয়বস্তুটা এতদিন ধরে যেটা চলে আসছে সেইটা তো একেবারেই বইকেন্দ্রীক। পাঠ্যপুস্তকে যে তথ্য ভরা আছে সেটাই পড়ানো ছিল শিক্ষকের কাজ এবং ছেলেমেয়েরা সেটা মুখস্থ করবে। মাষ্টারমশাই পড়া ধরবে। এই তো? তাতে অঞ্চলের জ্ঞানটা জানার কোন অবকাশই ছিল না। বর্তমানে আমরা এই জায়গাটাতে নিয়ে যেতে চাইছি। সেটা হচ্ছে আমার বাড়ীর বা পাড়ার শিক্ষিত মানুষ তো বটেই যাদেরকে নিরক্ষর মানুষ হিসাবে ভাবি তারা হয়তো লেখাপড়া খুব একটা জানে না কিন্তু গ্রামাঞ্চলে হাতে কলমে কাজ করার যে দক্ষতাটা আছে এবং জ্ঞানটা আছে সেই দক্ষতার জ্ঞানটাকে নেওয়া ও সেটাকে অন্যদের কাছে নিয়ে যাওয়া। এই ব্যাপারটা নতুন বিষয়বস্তুতে থাকছে।

প্রশ্নঃ আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে গরীব বাচ্চাদের জন্য কি ধরনের বিষয়বস্তু হলে আপনার মনে হয় স্কুলছুট কমানো যাবে?

উত্তরঃ আমাদের ভারতবর্ষে বেশীরভাগ লোক বাস করে গ্রামাঞ্চলে। এতদিন ধরে যেটা চলে আসছিল একটা বইকেন্দ্রীক তথ্যভিত্তিক শিক্ষা। এটাই ঠিক, বাকি সব ভুল। আরেকজন রয়েছে তথ্যের মাষ্টার। মাষ্টার একটা উঁচু মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে তিনি যা তথ্য দেবেন সেটাই ঠিক আর সব ভুল। ফলে ছেলে মেয়েদের আবিষ্কারের জায়গাটা ছিল না।

সেখান থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা চিন্তাভাবনা শুরু করে। ১৯৯৩ সালে অধ্যাপক যশপালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। যার নাম অনুসারে যশপাল কমিটি। তিনি বললেন "চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষা নয়", চার দেওয়ালে শুধু শিক্ষা পদ্ধতি চলবে না, বাহিরে বার করতে হবে।

২০০৫ সালে জাতীয় পাঠক্রম ফ্রেম ওয়ার্কে তাদের গাইডিং প্রিন্সিপালে ৫টা কথা বলেছে। সেটা হচ্ছে ছেলেমেয়েদের স্কুল ঘরের বাহিরের সঙ্গে তার জ্ঞানটাকে যোগ করা। তবেই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে জানবে। দ্বিতীয় হচ্ছে খালি বই মুখস্থ করে তো জ্ঞানটা সম্পূর্ণ হলো না। বইয়ের পড়া মুখস্থ হওয়ার ফলে যে জ্ঞান হলো, পরে আমি যদি কখনো তা মনে করতে পারি তাহলে সেটা হল, না হলে নয়।

পরীক্ষার পদ্ধতিটাও এমন যে ভাল মুখস্থ করে এসেছে, হয়ত সে কিছুটা শিখতে পারছে পরীক্ষায়, কৃতকার্যও হচ্ছে। যে পারছে না, সে কিছু জানলেও না, অকৃতকার্য হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ সেখান থেকে তারা বলছে গঠনমূলক জ্ঞান নির্মাণ কর। আসলে জ্ঞান নির্মাণের ব্যাপারটা বেশ চমকপ্রদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক আগেই বলেছেন যে, "বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই একটা পাঠ্যপুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলো পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক", অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকের ভার।

"আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে কখন অনেক পড়িবার শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আনন্দ পাইলেই তবেই তার পড়িবার শক্তি বাড়বে", সুতরাং জাতীয় পাঠক্রম ফ্রেমওয়ার্ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করেছে। অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের সার্বিক বিকাশের জন্য পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রীকে যে অবস্থা সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে বলা হচ্ছে।

প্রশ্নঃ গ্রামাঞ্চলে বেশিরভাগই ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে না। এই যে বাকি অংশটার জন্য স্কুল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ ও বাড়তি জীবিকার সুযোগ কি দেওয়া যায়?

উত্তরঃ প্রস্তাবটা খুবই ভালো। এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা চলছে। যাতে স্কুল ছুটের সংখ্যাটা না বাড়ে স্কুলে তাদের একটা জায়গা দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা আগামী দিনে করব। হাতে কলমে গ্রামের কিছু জীবিকার কাজ যাতে তারা করতে পারে। পেশাভিত্তিক শিক্ষা গ্রামের স্কুলগুলিতে নিয়ে যাওয়ার একটা উদ্যোগ চলছে।

প্রশ্নঃ বিগত দিনে একটি নতুন উদ্যোগ শুরু হয়ে ছিল উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে পেশাগত কোর্স করানো, তার বর্তমান অবস্থা কি?

উত্তরঃ বিগত দিনে যে চেষ্টাটা হয়ে ছিল সেটা বর্তমানে একটু গতি পেয়েছে। এখন এটা অনেক স্কুলে চালু করা হয়েছে অঞ্চল ভিত্তিতে কি চাহিদা কী ধরনের কাজ ছেলেমেয়েরা করতে চাইছে সেই অঞ্চলের কী কী চাহিদা রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে শাখা নির্বাচন করা হয়েছে এবং সেই শাখা নির্বাচন করে স্কুলগুলিতে পেশাগত কোর্স চালু হয়েছে। আসলে আমরা এখন পড়ার থেকে দক্ষতাটা চাইছি।

প্রশ্নঃ পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বিষয়বস্তু গান, নাটক, কৃষি, সেলাই এইসব গুণকেও কি আগামী দিনে ভাবা হচ্ছে?

উত্তরঃ সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে প্রত্যেকটা স্কুল নাটক, গান, নাচ, কৃষি ইত্যাদি যাতে শুরু করে। ২০১৩ থেকে এগুলো চালু হয়ে যাচ্ছে এখন থেকে এগুলো পাঠক্রমের মধ্যেই চলে আসছে।

ছেলেমেয়েদের সার্বিক বিকাশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নাচ, গান, হাতে কলমে চাষের কাজ এই সমস্ত কিছুকেই আমাদের শিক্ষা প্রক্রিয়ায় রাখা হয়েছে।

প্রশ্নঃ গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ শিক্ষকরা অনেক দূর থেকে আসে। তাতে শিক্ষাব্যবস্থার কতটা সত্যি করে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব?

উত্তরঃ এটা তো একটা প্রশাসনিক প্রশ্ন। তবে একটা সমস্যা প্রশাসনিক এবং অ্যাকাডেমিক্ যখন দুটো হাত ধরাধরি করে চলবে তখন এর উত্তর মিলবে। এটা দূর আমাদের - করতেই হবে। না হলে রূপ দেওয়া খুব অসুবিধা হবে।

প্রশ্নঃ আপনার কি মনে হয় শিক্ষা বিষয়ক "নব দিশা" পত্রিকা গ্রামের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মাধ্যম হিসাবে কীভাবে ব্যবহৃত হতে পারে?

উত্তরঃ শিক্ষাচর্চার ক্ষেত্রে পত্রিকার ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একটা ব্যাপার আমাদের দেখতে হবে সেটা হচ্ছে শিক্ষকদের তরফ থেকে চাহিদাটা থাকা দরকার। উৎসাহদানের ক্ষেত্রে পত্রিকার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। যদি সঠিকভাবে পত্রিকাটি নিয়ে যাওয়া যায়। অবশ্যই এরকম একটা পত্রিকার দরকার যারা এই পত্রিকার মাধ্যমে চর্চা করবেন।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ নবদিশা পত্রিকার পক্ষ থেকে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের পরিসংখ্যান

	২০০১	২০০৬	২০১১
১৬+ মেয়ে ও ছেলের সংখ্যা	১৬,২৯,০০০	১৮,৩৩,০০০	১৭,৮১,০০০
মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী	৫,৭৬,০০০	৭,৫১,০০০	৯,৯৬,০০০
শতকরা কত ছেলেমেয়ে মাধ্যমিকে পৌঁছাল না	৬৫%	৫৯%	৪৪%

অতীত, বর্তমান ও... *৪ পাতার পর*

বিদ্যাদানই করতেন না, ছাত্রদের কাছ হতে খাওয়া-পরার মূল্য পর্যন্ত নিতেন না। এমনিভাবে সর্বাঙ্গীন প্রাণশক্তি গ্রামে গ্রামে পরিব্যপ্ত হয়েছে। তাই তখন জলের অভাব হয়নি, অন্নের অভাব হয়নি, মানুষের চিত্তকে উপবাসী থাকতে হয়নি। তাতে আঘাত করল যখন ইউরোপীয় আদর্শে পশ্চিমি মডেলে নগরগুলি দেশের মর্মস্থান হয়ে উঠতে লাগল। গ্রামীণ সমাজ গেল শুকিয়ে। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী যেটার উপর জোর দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে সত্য। দারিদ্র হোক, মানুষ যে দুঃখ ভোগ করে তার মূলে সত্যের ত্রুটি। মানুষের ভিতরের যে সত্য তার মূল হচ্ছে তার ধর্মবুদ্ধিতে, এই বুদ্ধির জোরে পরস্পরের সঙ্গে মানুষের মিলন গভীর হয়, সার্থক হয়। এই সত্যটি যখনই বিকৃত হয়ে, দুর্বল হয়ে পড়ে, তখনই তার জলাশয়ে জল থাকে না, তার ক্ষেতে শষ্য সম্পূর্ণ ফলে না, সে রোগে মরে, অজ্ঞানে অন্ধ হয়ে পড়ে। মনের যে দৈন্যে মানুষ আপনাকে অন্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে সেই দৈন্যে সে সকল দিকেই মরতে বসে, তখন বাইরের দিক থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না।

গ্রামে আগুন লাগলে, দেখা গেল সে আগুন সমস্ত গ্রামকে ভস্ম করে তবে নিবল। এটি হল বাইরের কথা, ভিতরের কথা হচ্ছে অন্তরের যোগে মানুষে মানুষে ভালো করে মিলতে পারল না; সেই অমিলের ফাঁক দিয়ে আগুন বিস্তীর্ণ হয়। সেই অমিলের ফাঁকেই বুদ্ধি জীর্ণ হয়। সাহসীকে কাবু করে, সকল রকম কর্মকেই বাধা দেয়। এই জন্যই পূর্ব থেকে কাছে কোথাও জলাশয় প্রস্তুত ছিল না। এই জন্যেই জ্বলন্ত ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সকলেই কেবল হাহাকারেই কণ্ঠ মিলিয়েছে, আর কিছুতেই তাদের শক্তির মিল হয়নি। তাই নিজের কাজ নিজেকে করিতে হইবে, নিজের সম্পদ নিজেকে অর্জন করিতে হবে, নিজের সম্মান নিজেকে উদ্ধার করিতে হবে।

এক জায়গায় এক হবার চেষ্টা যত ক্ষুদ্র আকারে হউক, আরম্ভ করিতে হবে। আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যে এমন খাঁটি লোক, শক্ত লোক যাঁরা আছেন, যাঁরা দেশের কল্যাণকর্মকে দুঃসাধ্য জানিয়াই দ্বিগুণ উৎসাহ অনুভব করেন, এবং সেই কর্মের আরম্ভকে অতি ক্ষুদ্র জানিয়াও উৎসাহ হারান না, তাঁদেরকে এক করিতে হইবে।

তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে, বর্তমানে উন্নয়ন ভাবনার মূলে রয়েছে তিনটে জিনিস। এক প্রলোভন, দুই একক জীবনের প্রতি মোহ, তিন মুল্যবোধহীনতা। এই তিনটি জিনিস মানুষকে নতুন ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। উন্নয়ন তো শুধু অর্থনীতির সাথে যুক্ত নয়। এর সঙ্গে যেমন অর্থনীতির যোগ আছে, তেমনি আমোদপ্রমোদের কথা আছে, আরাম ও সুখের কথা আছে, আছে ব্যক্তিগত শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তার কথাও। ■■

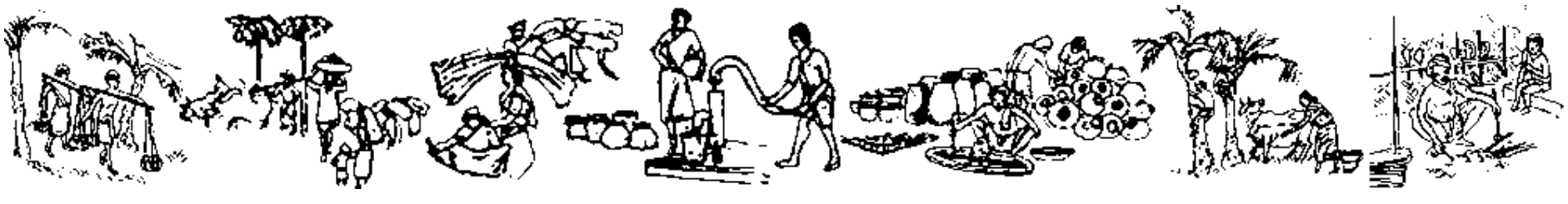

নবদিশা-র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবি রায় কর্তৃক ৫/১/২/জি কর্ণফিল্ড রোড, কলিকাতা -৭০০০১৯ হইতে প্রকাশিত ও শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।

FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY